প্রস্তাবিত পুলিশ অধ্যাদেশ ও নাগরিক ভাবনা

সচিবালয়, 'সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক' (২৭ এপ্রিল, ২০০৮)

বিদ্যমান *পুলিশ এ্যাক্ট, ১৮৬১* প্রায় ১৫০ বছর আগে বৃটিশ শাসনামলে প্রণীত। বৃটিশ শাসকরা তাদের শাসনকার্য নির্বিঘ্নে পরিচালনার লক্ষ্যেই মূলত এ আইন প্রণয়ন করে। তাই সঙ্গত কারণেই এতে উপমহাদেশের সাধারণ জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে নি। এছাড়াও গত দেড়শ' বছরে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে এবং জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুণ। একইসাথে পাল্টে গেছে সমাজে অপরাধের ধরন। উপরন্তু বৃটিশদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আইনটি প্রণীত হওয়ার কারণে, এটির দ্বারা একটি স্বাধীন ও আধুনিক গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জনগণের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়।

এছাড়া দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমাদের অতীতের সরকারগুলো বিদ্যমান আইনের অধীনে পুলিশ বাহিনীকে কাজে লাগিয়েছে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে। ব্যবহার করেছে প্রতিপক্ষকে দমন-পীড়নের হাতিয়ার হিসেবে। এমতাবস্থায় পুলিশ বাহিনীকে অযাচিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত, জনকল্যাণমূখি ও আধুনিক করার লক্ষ্যে এর সংস্কার এবং এজন্য একটি যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন জরুরি হয়ে পড়েছে। আনন্দের কথা যে, বর্তমান সরকার এলক্ষ্যে 'বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ-২০০৭' এর খসড়া প্রস্তুত করেছে। এতে পুলিশকে 'বহিনী'র পরিবর্তে 'সার্ভিস' হিসেবে গণ্য করে এটিকে সেবামুখি, জনবান্ধব, পেশাদার ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গিকার করা হয়েছে। পুলিশকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসাবে বিবেচেনা করার পরিবর্তে সামাজিক ন্যায়বিচার অর্জনের জন্য কল্যাণধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখার বাসনা ব্যক্ত করা হয়েছে। তবে প্রস্তাবিত অধ্যাদেশটি সম্পর্কে আমাদের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে, যা তুলে ধরাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য। আশা করি যে, সরকার আমাদের প্রশ্নগুলো এবং নাগরিক সমাজ ও সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে অধ্যাদেশটির চূড়ান্ত করবে, যাতে আমাদের দেশে পেশাদারিত্বসম্পন্ন, সেবাধর্মী ও কর্তৃপক্ষের সকল অবৈধ হস্তক্ষেপমুক্ত একটি আধুনিক পুলিশ বাহিনী গড়ে উঠতে পারে।

প্রস্তাবিত অধ্যাদেশটিতে ১৫টি অধ্যায় রয়েছে: (১) প্রারম্ভিক (সংজ্ঞা), (২) পুলিশের ভূমিকা দায়িত্ব ও কর্তব্য, (৩) পুলিশ সংগঠন, (৪) জাতীয় পুলিশ কমিশন, (৫) মেট্রোপলিটন ও নগর পুলিশ ব্যবস্থা, (৬) অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও জন শৃঙ্খলা সমস্যা, (৭) মানব সম্পদ উন্নয়ন, (৮) পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষ, (৯) আচরণ ও শৃঙ্খলা, (১০) কল্যাণ, (১১) পুলিশ পলিসি গ্রুপ, (১২) জনসমাবেশ, শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, (১৩) জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ ব্যবস্থাদি, (১৪) অপরাধ ও দণ্ড, এবং (১৫) বিবিধ।

পুলিশের ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য (অধ্যায় ২):

এ অধ্যায়ে পুলিশের সুস্পষ্ট দায়িত্ব, কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। জনসাধারণের প্রতি সম্মান ও সৌজন্যের সাথে সাথে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও বহাল রাখার লক্ষ্যে অনেকগুলো বিষয় পুলিশের দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও দুর্গত অবস্থায় এবং দুর্ঘটনায় কবলিত ব্যক্তিদের সহায়তা প্রদান এবং সন্দেহভাজন অপরাধীদের সমন, গ্রেফতারী পরোয়ানা, তল্লাশী পরোয়ানা ইত্যাদি আদেশ জারি করার জন্য আদালতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ আবেদন করা ইত্যাদি পুলিশের দায়িত্বের আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

মন্তব্য: এ অধ্যায়ে বর্ণিত পুলিশের ভূমিকা, দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কিত বিষয়াদি সার্বিকভাবে গ্রহণযোগ্য, তবে এগুলোর যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রয়োগ অবশ্য নির্ভর করবে ক্ষমতাসীনদের রাজনৈতিক অঙ্গিকার এবং পুলিশের নিজেদের দক্ষতা, পেশাদারিত্ব ও দায়বদ্ধতার ওপর। চূড়ান্ত আইনে পুলিশের দায়িত্বের বিষয়ে রিএ্যাক্টিভ কাজের সাথে সাথে প্রোএ্যাক্টিভ কাজের ওপর গুরুত্ব দেয়া আবশ্যক।

পুলিশ সংগঠন (অধ্যায় ৩):

এই অধ্যায়ে পুলিশ প্রধানের নিয়োগ ও ক্ষমতা; পুলিশের তত্ত্বাবধান; পুলিশ প্রশাসন; উপদেষ্টা ও বিশেষজ্ঞ নিয়োগ; পুলিশ রেঞ্জ; জেলা পুলিশ প্রধান ও প্রশাসন; মেট্রোপলিটন ইত্যাদি এলাকায় পুলিশ প্রশাসন; তদন্ত ও গোয়েন্দা শাখার পোস্টিং; তদন্ত খরচ; স্পেশাল ব্রাঞ্চ ও অপরাধ তদন্ত বিভাগ; পুলিশের কারিগরি ও সহায়ক সার্ভিস; পুলিশ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান; জুনিয়র র‍্যাংকে নিয়োগ ও স্পেশাল পুলিশ অফিসার ও অতিরিক্ত পুলিশ নিয়োগ; পুলিশের পদোন্নতি; প্রশিক্ষণ ও সাময়িক দরখাস্ত ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মন্তব্য: বিদ্যমান ভারটিক্যাল সাংগঠনিক কাঠামো বা অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী, আইজি সর্বোচ্চ পদাধিকারী পুলিশ কর্মকর্তা, যিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত। এরপর অতিরিক্ত আইজি, ডিআইজি, অতিরিক্ত ডিআইজি এভাবে ক্রমান্বয়ে কন্সটেবল পর্যন্ত পুলিশের একটি কাঠামো বর্তমানে বিরাজমান। প্রস্তাবিত খসড়া অধ্যাদেশে কোন অর্গানোগ্রাম দেখানো হয় নি। তাই প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় পুলিশ কমিশন, পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষ, পুলিশ গবেষণা ব্যুরোর অবস্থান কোথায় এবং তাদের সাথে কীভাবে সমন্বয় সাধন করা হবে তা স্পষ্ট নয়।

পুলিশ প্রধান নিয়োগ ও মেয়াদ এবং অন্যান্য পদে নিয়োগ (অধ্যায় ৩):

প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ অনুযায়ী: (ক) জাতীয় পুলিশ কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত তিনজন পুলিশ অফিসারের তালিকা থেকে সরকার একজনকে পুলিশ প্রধান হিসাবে নিয়োগ প্রদান করবে। (খ) নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাভাবিক অবসর গ্রহণের তারিখ যাই হোক না কেন, পুলিশ প্রধান অফিসের মেয়াদ অন্যূন দুই বছর এবং অনুর্ধ্ব তিন বছর হবে। (গ) পুলিশ প্রধানের পরামর্শক্রমে এবং জাতীয় পুলিশ কমিশন কর্তৃক সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ও তদুর্দ্ধ পদসমূহে নিয়োগ ও বদলী করবে। (ঘ) শুধুমাত্র পুলিশ প্রধানের সুপারিশ অনুযায়ী পুলিশের উপ-মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত উপ-মহাপরিদর্শক, সিনিয়র পুলিশ সুপার, পুলিশ সুপার পদসহ জেলা পুলিশ প্রধান নিয়োগ ও বদলী করবেন। বিশেষ করে জেলা পুলিশ প্রধানের নিয়োগ ও বদলীর ক্ষেত্রে সরকার পুলিশ প্রধানের সুপারিশের সাথে একমত পোষণ না করলে এর কারণ লিপিবদ্ধ করে পুলিশ প্রধানের কাছে আর একটি মনোনয়ন চাইবেন। এরূপ পর পর তিনটি মনোনয়ন প্রস্তাবের সাথে সরকার দ্বিমত পোষণ করলে, সরকার এবং পুলিশ প্রধান উভয়ই জাতীয় পুলিশ কমিশনের সিদ্ধান্তের জন্য প্রেরণ করবেন। এক্ষেত্রে জাতীয় পুলিশ কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

মন্তব্যঃ রাজনৈতিক বিবেচনায় উচ্চ পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তাদের, বিশেষত পুলিশের মহাপরিদর্শকের ঘন ঘন বদলী একটি গুরুতর সমস্যা। উদাহরণস্বরূপ জোট সরকারের পাঁচ বছরে পুলিশ মহাপরিদর্শক পদে ছয়বার বদলী করা হয়েছে। তাই এই পদে স্থিতিশীলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে নিয়োগের মেয়াদ ন্যূনতম পক্ষে দুই বছর করার লক্ষ্যে শুধুমাত্র পুলিশ প্রধানের অবসর গ্রহণের বয়সসীমা শিথিল কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। শুধু পুলিশ প্রধানেরই নয়, সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারির বয়সসীমা বাড়াবার বিষয়টি একইসাথে বিবেচনায় আনতে হবে।

জেলা পুলিশ প্রধানের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বিধান গুরুতর প্রশ্নের উদ্রেক করে। এক্ষেত্রে পুলিশ প্রধানকে মন্ত্রণালয়ের প্রধান, এমনকি সরকার প্রধানের সমতুল্য করা হয়েছে বলে আমাদের আশংকা। আমাদের বিদ্যমান সংসদীয় পদ্ধতিতে, এমনকি অন্য কোন পদ্ধতিতেও সকল প্রশাসনিক পদে নিয়োগ প্রদানের এখতিয়ার প্রধানমন্ত্রী/সরকার প্রধান কিংবা তার মনোনীত ব্যক্তির। তাই প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অধিনস্ত পুলিশ প্রধানকে তাদের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার এবং তাদের পুলিশ প্রধানের সুপারিশের সাথে দ্বিমত করার কারণ লিপিবদ্ধভাবে জানানোর প্রস্তাবিত বিধানটি রাখা সমীচিন হবে বলে মনে হয় না। এখানে দায়বদ্ধতার প্রশ্ন জড়িত।

প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে জেলা প্রশাসনের সাথে জেলা পুলিশ প্রশাসনের সম্পর্ক কিরূপ হবে তার উল্লেখ নেই। অতীতে, ঔপনিবেশিক শাসকদের স্বার্থে, জেলা পুলিশ প্রধান জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাধারণ নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। সাম্প্রতিককালে, বিশেষত মেট্রোপলিটন সিটিগুলোতে এর পরবর্তন আনা হয়েছে। এ পরিবর্তনের অভিজ্ঞতার আলোকে ভবিষ্যতে সমন্বয়ের বিষয়টি কীভাবে সাধিত হবে তার একটি সুস্পষ্ট নির্দেশনা আইনে থাকা জরুরি।

তদন্ত খরচ (অধ্যায় ৩, ধারা ২০)
অধ্যাদেশে প্রতিটি তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক খরচ মেটানোর জন্য পুলিশ প্রধানকে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে।

মন্তব্যঃ
বর্তমানে তদন্তের জন্য ৩,০০০ টাকা অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে তদন্তের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে। 'পর্যাপ্ত' কথাটির মধ্যে অসম্পূর্ণতা রয়েছে। তদন্তের জন্য অর্থ বরাদ্দের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা প্রয়োজন, যাতে দুর্নীতির সম্ভাবনা দূর হয়।

স্পেশাল ব্রাঞ্চ, অপরাধ তদন্ত বিভাগ (অধ্যায় ৩, ধারা ২১)ঃ
পুলিশ প্রধানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দেশের অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব ও জনগণের সকল প্রকার নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ, বিশ্লেষণের জন্য 'স্পেশাল ব্রাঞ্চ' এবং গুরুতর অপরাধ তদন্তের জন্য 'অপরাধ তদন্ত বিভাগ/সিআইডি' নামে দু'টি পৃথক বিভাগ গঠনের বিধান রাখা হয়েছে।

মন্তব্যঃ এ বিভাগ দু'টির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক কীরূপ হবে সে বিষয়ে প্রস্তাবিত খসড়ায় কোন কিছু উল্লেখ নেই।

কারিগরি ও সহায়ক সার্ভিস (ধারা ২৩)ঃ
এ ধারায় পুলিশ প্রধানের সার্বিক নিয়ন্ত্রণে পুলিশ সার্ভিসের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পৃথক তথ্য, যোগাযোগ ও টেলিকম সার্ভিস সৃষ্টির প্রস্তাব করা হয়েছে।

মন্তব্যঃ পুলিশ প্রশাসনের কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণ এবং প্রধানের কাজের চাপ কমানোর জন্য পুলিশ প্রধানের পরিবর্তে একজন অতিরিক্ত আইজিপির অধীনে এটি গঠন করা যেতে পারে। এ ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা থাকা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

জুনিয়র র‍্যাংকে নিয়োগ (ধারা ২৬)ঃ
এ ধারায় জেলার ক্ষেত্রে জেলা পুলিশ প্রধান এবং অন্যান্য ইউনিটের ক্ষেত্রে সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশকে সহকারি ইন্সপেক্টর ও তদন্ি পদে নিয়োগের এবং উপ-মহাপুলিশ পরিদর্শককে ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ প্রদানের ক্ষমতা দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

মন্তব্যঃ একজন পুলিশ অফিসারের ওপর এককভাবে এই পদগুলোতে নিয়োগের দায়িত্ব প্রদান করায় অতীতের ন্যায় 'নিয়োগ বাণিজ্য' ছাড়াও দলীয় কর্মীদের নিয়োগের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে, যা কোনভাবেই কাম্য নয়। তাই এ সকল পদে মেধা, যোগ্যতা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদানের জন্য একজন অফিসারের পরিবর্তে বাইরের সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে একটি কমিটির ওপর দায়িত্ব প্রদান যুক্তিযুক্ত বলে আমরা মনে করি।

জাতীয় পুলিশ কমিশন (অধ্যায় ৪, ধারা ৩৭-৪৬)ঃ
অধ্যাদেশে এগারো (চেয়ারপার্সনসহ) সদস্যবিশিষ্ট একটি 'জাতীয় পুলিশ কমিশন' গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার চেয়ারপার্সন হবেন পদাধিকার বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কমিশনের অন্য সদস্যগণ হবেন চারজন সংসদ সদস্য (দুইজন সরকারি দলের ও দুইজন বিরোধী দলের), একজন নারীসহ চারজন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, স্বরাষ্ট্র সচিব ও পুলিশ প্রধান (সদস্য সচিব)। অরাজনৈতিক সদস্যদের নিয়োগের জন্য তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি জাতীয় সিলেকশন প্যানেল থাকবে, যার চেয়ারপার্সন হবেন প্রধান বিচারপতি এবং অপর দুই সদস্য হবেন দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও কন্ট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল। জাতীয় সিলেকশন প্যানেল কর্তৃক ছয়জন অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে রাষ্ট্রপতি চারজনকে নিয়োগ প্রদান করবেন। কতিপয় সুনির্দিষ্ট কারণে কমিশনের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশনের যে কোন সদস্যকে অপসারণ করা যাবে।

মন্তব্যঃ জাতীয় পুলিশ কমিশন গঠন একটি যুগোপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হলেও, এর চেয়ারপার্সন হিসাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিয়োগ এবং কমিশনের সদস্যদের অপসারণ পদ্ধতির কারণে কমিশনের গঠনের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ ও অপসারণের ব্যাপারে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কীভাবে রোধ করা যায় সে বিষয়টি আরো গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন। প্রধান বিচাপতির পদটি নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও অত্যন্ত সম্মানিত পদ। এই পদটি নিয়ে ভবিষ্যতে যাতে কোন বিতর্কের সৃষ্টি না হয়, সেদিকে সকলের দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। তাই জাতীয় পুলিশ কমিশনের নিরপেক্ষ সদস্য নিয়োগের জন্য সিলেকশন প্যানেলের চেয়ারপার্সন হিসাবে প্রধান বিচারপতির পরিবর্তে তাঁর মনোনীত একজন বিচারপতিকে নিয়োগ দেয়া যায় কি না তা ভেবে দেখা দরকার। একইসাথে নাগরিক সমাজের একজন প্রতিনিধিকে সিলেকশন প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

মেট্রোপলিটন ও নগর পুলিশ ব্যবস্থা (অধ্যায় ৫ম):
সরকার যে কোন মেট্রোপলিটন এলাকা বা অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকার জন্য বিদ্যমান মেট্রোপলিটন পুলিশ আইনের মতো বিধি-বিধানের ভিত্তিতে 'মেট্রোপলিটন পুলিশ' ইউনিট প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

মন্তব্য: সিটি কর্পোরেশনের মেয়রগণ প্রায়ই বলে থাকেন আইন-শৃঙ্খলাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমে মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পান না। অনেকেই মেট্রোপলিটন এলাকায় আইন-শৃঙ্খলাসহ সকল সেবা প্রদানকারী সংস্থার কার্যাবলির সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্য মেট্রোপলিটন গর্ভমেন্ট প্রতিষ্ঠার কথা ভাবছেন। এলক্ষ্যে 'মেট্রোপলিটন পুলিশ' ইউনিটকে সিটি কর্পোরেশনের অধীনে রাখা বা 'মেট্রোপলিটন পুলিশ' ইউনিটের কার্যক্রমকে সিটি কর্পোরেশনের সাথে কীভাবে সমন্বয় করা যায়, তা ভেবে দেখা প্রয়োজন। এভাবে বিকেন্দ্রিভূত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সৃষ্টির উদ্যোগের সূচনা হতে পারে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন (অধ্যায় ৭ম):
পুলিশের সকল কাজ সম্পাদনের মান ও দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে গবেষণা ও বিশ্লেষণের লক্ষ্যে একটি পুলিশ 'গবেষণা ব্যুরো' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই 'গবেষণা ব্যুরো' যে সকল বিষয়ে গবেষণা/কার্যক্রম পরিচালনা করবে তার একটি নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে।

মন্তব্য: গবেষণা কার্যক্রমে অপরাধ, অপরাধের সামাজিক প্রেক্ষাপট, অপরাধ সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ, পুলিশ প্রশাসনের কার্যকারিতা ইত্যাদি বিষয়গুলো যুক্ত হওয়া প্রয়োজন, যা প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে অনুপস্থিত। এ সকল বিষয়ে গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গবেষণা ব্যুরো'র সাথে যুক্ত করা যেতে পারে। পুলিশের দক্ষতা, শিক্ষা ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য 'সরদহ পুলিশ একাডেমি ও পুলিশ স্টাফ কলেজ' রয়েছে, যা ১ লক্ষ ২৩ হাজার পুলিশ সদস্যের জন্য যথেষ্ট নয়। এই বিশাল পুলিশ সদস্যের ও তাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য সশস্ত্র বাহিনীর ন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যেতে পারে।

পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ ট্রাইব্যুনাল গঠন (অধ্যায় ৮, ধারা ৭১ ও অধ্যায় ৯, ধারা ৮৩)
ক) পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তদন্ত করার উদ্দেশ্যে অধ্যাদেশে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট 'পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষ' গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যার চেয়ারপার্সন হবেন আপিল বিভাগের বিচারক বা জাতীয়ভাবে সুনামের অধিকারী কোন ব্যক্তিত্ব। অন্যান্য সদস্যরা হবেন একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিব বা অতিরিক্ত সচিব, একজন অবসরপ্রাপ্ত আইজিপি বা অতিরিক্ত আইজিপি, নাগরিক সমাজের দুইজন বিখ্যাত ব্যক্তি, যার একজন হবেন নারী। পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষ সদস্য নিয়োগের জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি সিলেকশন প্যানেল থাকবে। খ) প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য পুলিশ ট্রাইব্যুনালের বিধান রাখা হয়েছে।

মন্তব্য: পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তদন্তের জন্য বহিঃর্বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ গঠন একটি প্রশংসনীয় প্রস্তাব। তবে এখানে কোন ধরনের অপরাধ 'গুরুতর' অপরাধ বলে বিবেচিত হবে তা সুস্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। এছাড়াও পুলিশ সদস্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিচারের জন্য পুলিশ ট্রাইব্যুনালে মামলা করা যাবে। এখানে পুলিশ ট্রাইব্যুনাল এবং পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষের সম্পর্ক কীরূপ হবে সেটিও স্পষ্ট নয়। তাছাড়া পুলিশ ট্রাইব্যুনালের সাথে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের সম্পর্ক কীরূপ হবে এ বিষয়েও খসড়া অধ্যাদেশে কোন উল্লেখ নেই। আরো উল্লেখ্য যে, ধারা ৮৬(২) অনুসারে পুলিশ ট্রাইব্যুনাল বা এর আপীল কর্তৃপক্ষের কোন আদেশ বা রায়ের বিরুদ্ধে কোন আদালত বা ট্রাইব্যুনালে আপিল করা যাবে না, যা সংবিধান প্রদত্ত একজন নাগরিকের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থি।

পুলিশ পলিসি গ্রুপ গঠন (অধ্যায় ১১):
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে উর্দ্ধতন পুলিশ কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে 'পুলিশ পলিসি গ্রুপ' গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ গ্রুপ পুলিশের পেশাগত মান, নৈতিকতা, দক্ষতা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, চাকুরির শতাবলী ইত্যাদি বিষয়ে জাতীয় পুলিশ কমিশন, পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষ প্রভৃতির সাথে মতবিনিময় করে সরকারের নিকট সুপারিশ করবে।

মন্তব্য: 'পুলিশ পলিসি গ্রুপ' এবং 'পুলিশ গবেষণা ব্যুরো'র কার্যক্রম অনেকটা একই ধরনের। তাই এই দু'টি বিভাগের কার্যক্রমে ডুপ্লিকেশনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে হয়। তাছাড়া এই দু'টি বিভাগের সমন্বয় প্রক্রিয়াটি কীরূপ হবে তাও অধ্যাদেশে অনুপস্থিত।

অপরাধ ও দণ্ড (অধ্যায় ১৪, ধারা ১৩৮):
কোন পুলিশ সদস্যের বিরূদ্ধে কোন অভিযোগ পুলিশ কর্তৃপক্ষ বা পুলিশ অভিযোগ কর্তৃপক্ষের তদন্তে তুচ্ছ বা বিরক্তিকর প্রতীয়মান হলে অভিযোগকারীকে ৩ মাসের কারাদণ্ড বা ২০ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে।

মন্তব্য: লক্ষ্যণীয় যে, এখানে মিথ্যা বা হয়রানিমূলক শব্দ দু'টি উল্লেখ করা হয় নি – বলা হয়েছে 'তুচ্ছ' বা 'বিরক্তিকর'। অর্থাৎ অভিযোগ সত্য হলেও কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তা 'তুচ্ছ' বা 'বিরক্তিকর' প্রতীয়মান হলে অভিযোগকারী দণ্ডপ্রাপ্ত হবেন। রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক সকল সরকারের আমলেই পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহার সর্বজনবিদিত। এছাড়াও আমাদের দেশের জনগণ এমনিতেই পুলিশবিমুখ। এ বিধানের ফলে কোন নাগরিকই পুলিশের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের করবে কি না এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

সরল বিশ্বাসে কর্তব্য সম্পাদনের কারণে কোন পুলিশ অফিসার দণ্ডিত হবেন না এবং পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করা যাবে না (অধ্যায় ১৫, ধারা ১৪৪ ও ১৪৫):

সরল বিশ্বাসে সম্পাদিত কোন কাজের জন্য কোন পুলিশ অফিসার দণ্ডিত হবেন না, বা কোন ক্ষতিপূরণ প্রদান করবেন না। এছাড়াও সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন অফিসার বা তার অনুমোদন ব্যতীত কোন পুলিশ অফিসারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে ফৌজদারি কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না।

মন্তব্য: 'সরল বিশ্বাস' এর সংজ্ঞা বা মাপকাঠি কি? এ বিধানের ফলে গুরুতর অপরাধ করেও অনেক পুলিশ অফিসার পার পেয়ে যাবেন এবং তাদেরকে শাস্তির আওতায় আনা যাবে না বলে আমরা মনে করি।

সুপারিশ: (ক) আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে উপজেলা/থানার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনগণ সাধারণত থানাতেই প্রাথমিক অভিযোগ দাখিল বা মামলা রুজু করে থাকেন। অথচ প্রস্তাবিত পুলিশ অধ্যাদেশে থানা বা উপজেলা পুলিশ প্রশাসন সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নি। জনগণের সাথে থানার সম্পর্কের উন্নতির বিষয়েও কোন কথা নেই। থানা/উপজেলা পুলিশ প্রশাসন থেকে সাধারণ জনগণ কীভাবে তাৎক্ষণিক সেবা পেতে পারে, সে বিষয়টিও এখানে অনুপস্থিত। থানার ওসি অভিযোগ গ্রহণ না করলে, তার প্রতিকার কি? প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে থানার পুলিশ সদস্য সংখ্যা ও অর্থ বরাদ্দের বিষয়েও কোন উল্লেখ নেই। থানা পুলিশ প্রধানের পদমর্যাদাও এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। থানা প্রধানের পদমর্যাদা নূন্যতম এএসপি হওয়া উচিৎ, কারণ ওসি ছাড়া উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ প্রথম শ্রেণীর। আমরা থানার কার্যক্রমের স্বচ্ছতার জন্য প্রত্যেক থানায় একটি করে 'ট্রান্সপারেন্সি বোর্ড' রাখার প্রস্তাব করছি, যেখানে অপরাধের সংখ্যা ও ধরণ দায়েরকৃত অভিযোগের সংখ্যা, তদন্তের অগ্রগতি ইত্যাদির বিবরণ থাকবে। জনগণের সাথে পুলিশের যোগাযোগ ও সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউনিয়নভিত্তিক 'নাগরিক পুলিশ কমিটি' গঠন করা যেতে পারে।

(খ) প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়, মামলা তদন্ত কর্মকর্তাকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের পূর্বেই অন্যত্র বদলী করা হয়ে থাকে। ফলে মামলার তদন্ত কার্যক্রম ব্যহত হয় এবং তদন্ত প্রতিবেদন বা চার্জশীট দাখিলে দীর্ঘসূত্রীতার সৃষ্টি হয়। এ সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। এছাড়াও তদন্ত কর্মকর্তাকে আদালতে হাজির হয়ে সাক্ষ্য দিতে হলেও, মামলা তদন্ত সুপারভাইজারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও তাকে আদালতে হাজির হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করতে হয় না। উপরন্তু তদন্ত কর্মকর্তার গাফিলতি ও ত্রুটিপূর্ণ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য গুরুতর অপরাধে অভিযুক্তরা প্রায়শই পার পেয়ে যায়। প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে এ সকল সংকট নিরসনের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা নেই। তাই এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রস্তাবনা হলো একটি নির্দিষ্ট সময়, অর্থাৎ দুই বা তিন বছর না হলে বা সুস্পষ্ট অভিযোগ ব্যতীত কোন তদন্ত কর্মকর্তাকে বদলী বা অপসারণ না করা। এছাড়াও পুলিশের তদন্ত ও প্রসিকিউশন কার্যক্রমকে আলাদা করাও যুক্তিযুক্ত বলে অনেকে মনে করেন।

(গ) আমাদের দেশে যে সরকার যখন ক্ষমতায় এসেছে সে তখন দলীয় স্বার্থে পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করেছে এবং পুলিশ কর্মকর্তাগণও অযথা হয়রানির ভয়ে সরকারের বৈধ/অবৈধ সকল প্রকার নির্দেশ বিনা বাক্য ব্যয়ে প্রতিপালন করে থাকে। মূলত সরকারি নিদের্শেই পুলিশ, বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের হয়রানী, গণ-গ্রেফতার বা মিছিলে অতিরিক্ত বল প্রয়োগ করে থাকে। আমরা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপমুক্ত পুলিশ প্রশাসন দেখতে চাই। কিন্তু এই রাজনৈতিক অপব্যবহার বন্ধ করতে গিয়ে পুলিশ প্রশাসন যেন সরকারের নিয়ন্ত্রণহীন না হয়ে পড়ে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি প্রদান করতে হবে। প্রস্তাবিত পুলিশ অধ্যাদেশে পুলিশ প্রধানকে যে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে, তার ফলে সরকারের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের মনে রাখতে হবে, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নির্বাচিত সরকারের অধীনে সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। পুলিশও এর ব্যতিক্রম নয়, তাই এ ব্যাপারে একটি ভারসাম্য প্রয়োজন। এছাড়াও বর্তমান প্রস্তাবনায় একটি কেন্দ্রিভূত পুলিশ কাঠামো অব্যাহত থাকবে। পুলিশি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার জন্য পুলিশ প্রশাসনকে বিকেন্দ্রিকরণ করার কোন বিকল্প নেই।

(ঘ) রাষ্ট্রদূত/কূটনৈতিক/রাষ্ট্রীয় অতিথি/মন্ত্রীদের নিরাপত্তা ও প্রটোকল প্রদান পুলিশের অন্যতম দায়িত্ব। এ কার্যক্রম সম্পাদন করতে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কার্যক্রম ব্যাহত হয়। তাই এক্ষেত্রে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র 'প্রটোকল বিভাগ' গঠন করা যেতে পারে।

(ঙ) অধ্যাদেশে পুলিশ বাহিনীকে সব দিক থেকে দক্ষ, কর্মনিষ্ট ও আধুনিক করে গড়ে তোলার জন্য যুগোপযোগী ও বিজ্ঞানসম্মত প্রশিক্ষণের প্রতি সংস্কার প্রস্তাবে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে আমরা মনে করি, পুলিশ বিভাগের কর্মরত ব্যক্তিদের মানসিকতা, আচরণ পরিবর্তনসহ তাদেরকে নিরপেক্ষ, সৎ ও গণমুখি করে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য পুলিশ প্রশিক্ষণকালীন সময়ে এ সকল বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি নিবন্ধ করা জরুরি। তাদের কাছ থেকে দক্ষতা ও যথাযথ সেবা পেতে হলে তাদের শ্রম সীমা নির্ধারণ আবশ্যক।

(চ) উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের জনসংখ্যা ও অপরাধ অনুপাতে পুলিশ সদস্য সংখ্যা অনেক কম। উপরন্তু পুলিশ বাহিনীর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যদেরকে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত থাকতে হয়। তাই ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব বিআরটিএ বা পৌরসভা কর্পোরেশনের হাতে ন্যস্ত অথবা এ লক্ষ্যে একটি আলাদা প্রতিষ্ঠান গঠন করা যেতে পারে।

(ছ) প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে পুলিশ কর্মীদের বেতন কাঠামো, আবাসন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাদি সম্পর্কে আরো মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। কেউ কেউ ব্যঙ্গ করে বলেন যে, বর্তমানে তারা জেলখানার কয়েদীদের ন্যয় মানবেতর জীবন-যাপন করছে, যার পরিবর্তন জরুরি। কর্তব্য পালনকালীন অবস্থায় কোন পুলিশ সদস্য মৃত্যুবরণ করলে তার পরিবারের সদস্যদের আর্থিক নিরাপত্তাও নিশ্চিত করা প্রয়োজন। তাদের সার্বিক জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে একটি স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো থাকা জরুরি।

এটি সুস্পষ্ট যে, বিদ্যমান পুলিশ আইনের পরিবর্তে, আমাদের পুলিশ বাহিনীকে দক্ষ, স্বচ্ছ, দায়বদ্ধ, জনবান্ধব এবং মানবাধিকার ও নারীর অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করার লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী আইনি কাঠামো সৃষ্টি আজ অত্যন্ত জরুরি। এ সকল আকাঙ্ক্ষার আলোকেই প্রস্তাবিত অধ্যাদেশটির মূল্যায়ন ও সংশোধন এবং প্রতিষ্ঠানটির সংস্কার করা আবশ্যক। সংস্কারের ক্ষেত্রে পুলিশের চেইন অব কমাণ্ড যেন সুদৃঢ়, কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক হয় সেদিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করা প্রয়োজন।